বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ১৬৭-১৭৭
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

কৃষিপণ্যের (ধানের) মূল্য, প্রান্তিক কৃষকদের ভালোবাসার অর্থনীতি

মো: জাহাঙ্গীর আলম*

সারসংক্ষেপ *সমাজ, সভ্যতা, পরিবেশ, আর্থসামাজিক পরিকাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের আবাসস্থল স্বাধীন ভূখণ্ড এ বাংলাদেশেরও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ছাপ দৃশ্যমান। স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের পথে হাঁটছে বাংলাদেশ। এ ভূখণ্ডের সুদূর অতীত অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, কৃষিকে ধরে রেখেছে কৃষক, বংশপরম্পরায়। ইতিহাস-ঐতিহ্যের খাতিরে মাটির টানে অনুপস্থিত মুনাফায় বঞ্চনাকে ম্লান করে পথ চলছে কৃষি এবং কৃষক পরিবার। নেই উল্লেখযোগ্য কারিগরি জ্ঞান, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। প্রকৃতি আর লোকজ জ্ঞানই মূলত সম্পদ। ক্ষতি আর ক্ষতি লাভের প্রত্যাশা করলেও দেখা মেলেনি সহসা। মাটির মায়ার জালে বেঁধেছে নিজেকে নিজ পরিবার-পরিজনকে। হ্যাঁ বাংলাদেশের কৃষকদের কথাই বলছি। প্রকৃত সত্য হলো কৃষকেরা কৃষিপণ্য বিশেষ করে ইরি ধানের উৎপাদন ব্যয় তার উৎপাদিত পণ্য (ধান) বিক্রি করে তুলতে পারছে না। এ ঘটনা বেশির ভাগ সময়েই ঘটেছে। কেন উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কেন পণ্যের দাম বিশেষ সময়ে কম হয়, এতে লাভ কার, শোষণ কেমন, স্বল্প মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থসামাজিক প্রভাব কী? ইত্যাদি বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধের মূল বিষয়। কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পায় না কেন? যায় কোথায়? পেলে কৃষির কী লাভ হতো? কৃষকের অবস্থার কী পরিবর্তন হতো? কৃষিনির্ভর এ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির কী অবস্থা হতো? স্থিতিশীল উন্নয়নের অবস্থা কী হতো? আর্থিক লোকসান দিয়েও কৃষক কেন উৎপাদন করে চলেছে? কীসের মোহ? কী স্বার্থ ইত্যাদির আর্থসামাজিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এখানে সন্নিবেশিত এ সংকট উত্তরণের পথ কী? করবেই বা কে, দায় কার, এসব প্রশ্ন আর উত্তরের অনুসন্ধান এ প্রবন্ধের উপজীব্য।*

মূল শব্দ: *ফসলের ঘ্রাণ, অনুপস্থিত মুনাফা, পারিবারিক ভোগান্তি, আর্থসামাজিক নিঃশ্বায়ন, অনিচ্ছাকৃত ভালোবাসা, লাভজনক কৃষি কৌশল, কৃষিনির্ভর শিল্প উন্নয়ন।*

* সহকারী অধ্যাপক, সরকারী ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা; ফোন: ০১৭১০৮২৭৭৬, ই-মেইল: jahangir252540@gmail.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক খুলনা আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত, ২৩ নভেম্বর ২০১৯।

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি ছোট দেশ। দেশটির অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। কৃষিটা নির্ভর করছে একদল অশিক্ষিত আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বলতম, প্রকৃত অর্থেই অদক্ষ পরপুজির ওপর নির্ভরশীল, প্রশিক্ষণবিহীন ভেজাল কৃষি উপকরণ ব্যবহারকারী কৃষকের ওপর। আর দেশটার খাদ্যনিরাপত্তা এবং স্বয়ম্পূর্ণতা নির্ভর করছে এদের ওপর। এ কৃষককুল এবং তার পরিবারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর-এ পরিচালিত রাজস্ব খাতের কৃষিকর্মীরা মূলত ফিল্ড করেন সার ডিলার বা খুচরা কৃষিপণ্য বিক্রেতার দোকান পর্যন্ত; সেখান থেকে তথ্যের আদান-প্রদান হয় চলে কৃষি উৎপাদন, মূলত বহুমুখী সংকটের আবর্তে কৃষককুল। নিতান্তই তার নিজের প্রয়োজনে সামর্থ্যমতো কার্যসিদ্ধি করছেন। উৎপাদন এবং বিপণনপ্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি আর মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য। বংশপরম্পরায় ক্ষতি মেনে মাটির টানে ফসলের ঘ্রাণে উৎপাদন করে চলেছে কৃষক। কৃষক এবং দেশের স্বার্থে কৃষিকে লাভজনক করার কৌশল এখন সময়ের দাবি।

ইরি / বোরো মৌসুমে উৎপাদিত কয়েকটি ধানের নাম, বয়স ও ফলন

নাম	জীবনকাল	ফলন (একরপ্রতি)	মন্তব্য
ব্যাবিলন-২	১৩৫-১৪০ দিন	১২০-১৩০ মণ	উৎপাদনের হিসাবটি বীজ উৎপাদনকারী কোম্পানির, বাস্তবে উৎপাদন অনেক কম হয়।
মেঘনা	১৩৫-১৪০ দিন	১২০-১৩০ মণ	
তিনপাতা সুপার	১৩৫-১৪০ দিন	১১৫-১২৫ মণ	
তিনপাতা-১০	১৩০-১৩৫ দিন	১১৫-১২৫ মণ	
ইস্পাহানি-১,২,৬,৭,৮	১৩৫-১৪০ দিন	১২০-১৩০ মণ	
দুর্বার	১৩৫-১৪০ দিন	১২০-১৩০ মণ	
আগমণী	১৩৫-১৪০ দিন	১২০-১৩০ মণ	
ব্রি-ধান-২৮	১৩০-১৩৫ দিন	৮০-১০০ মণ	
হীরা-১,২	১৪০-১৪৫ দিন	১২০-১৩০ মণ	
সিনজেনটা এস-১২০৫	১৪০-১৪৫ দিন	১১৫-১২০ মণ	

ইরি বোরো মৌসুমে ধান উৎপাদনের ব্যয়ের হিসাব

ইরি ধানের উৎপাদন ব্যয়: (১ বিঘা ৫০ শতাংশ):

ইরি ধানের উৎপাদন ব্যয়কে মূলত তিনটি ধাপে বিশ্লেষণ করা দরকার।

(ক) বীজতলা প্রস্তুত থেকে চারা উৎপাদন পর্যন্ত।

(খ) চারা তোলা, রোপণ এবং ফসল কাটা পর্যন্ত।

(গ) ফসল কাটা থেকে মাড়াই এবং বাজারজাতকরণ পর্যন্ত।

(ক) বীজতলা প্রস্তুত থেকে চারা উৎপাদন পর্যন্ত

কার্যক্রম	ব্যয় (টাকা)
১। বীজ ক্রয় ৩ কেজির/ ৩ প্যাকেট	৩০০ × ৩ = ৯০০/-
২। বীজতলা ভাড়া ৬ শতাংশ	১০০ × ৬ = ৬০০/-
৩। বীজতলা তৈরি কর্ষণ/চাষ ২ বার	২৫০ × ২ = ৫০০/-
৪। বীজতলা তৈরি শ্রমের মজুরি (বপনসহ)	৪০০ × ১ = ৪০০/-
৫। বীজতলায় সার, কীটনাশক, পানি প্রয়োগ, সার উপরিপ্রয়োগ, ভিটামিন, আগাছা দমন, কুয়াশা ভাঙা (নূন্যতম ৩০ দিন)	= ৯৫০/-
এ পর্বের ব্যয়	= ৩৩৫০/-

(খ) চারা তোলা, রোপণ এবং ফসল কাটা পর্যন্ত

কার্যক্রম	ব্যয় (টাকা)
১। জমি ভাড়া/লিজ	৬০০০ ÷ ২ = ৩০০০/-
২। জমি প্রস্তুত চাষ/কর্ষণ (৩ চাষ)	৬০০ × ৩ = ১৮০০/-
৩। জমি রোপণ উপযোগী করা আইল ছাটা মই দেওয়া , নালা এবং কাচা তৈরি	৪০০ × ১ = ৪০০/-
৪। সার প্রয়োগ রোপণকালীন টিএসপি, এমপি, ইউরিয়া, সালফার, দস্তা, কীটনাশক ইত্যাদি।	= ১৫০০/-
৫। চারা রোপণ শ্রম ব্যয় ৮ জন	৪০০ × ৮ = ৩২০০/-
৬। আগাছা দমন কীটনাশক (ঔষধের সাথে মিশ্রিত সার সহ)	= ৩০০/-
৭। সার উপরিপ্রয়োগ এবং কীটনাশক (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার)	
৮। নিড়ানী এবং মাটি উলটপালট (২ বার)	= ১৪৮০/-
৯। সার, ভিটামিন, কীটনাশক, স্প্রেজনিত শ্রম ব্যয় এবং মেশিন ভাড়া (ন্যূনতম ২ বার তবে ব্লাস্টসহ অন্য রোগ হলে অধিকার)	(৪০০×৩)×২ = ২৪০০/-
১০। পানি সেচ বিদ্যুৎচালিত	(৪০০×২)+১০০ = ৯০০/-
	= ২৫০০/-
	সর্বমোট = ১৭, ৪৮০/-

* দো-ফসলী জমি ফলে ১ ফসলের জমি ভাড়া ৬০০০ গুণ ২ ।
* ১ টা শ্রমের মূল্য ৮ ঘণ্টা = ৪০০ টাকা ধরে।
* কীটনাশক স্প্রে ২ বার ধরা হয়েছে। ব্লাস্টসহ অন্য রোগ হলে অধিকবার তার হিসাব ধরা হয়নি।
* ডিজেল চালিত সেচ হলে এর অধিক ব্যয়, তার হিসাব ধরা হয়নি।

(গ) ফসল কাটা থেকে মাড়াই এবং বাজারজাতকরণ পর্যন্ত

কার্যক্রম	ব্যয় (টাকা)
১। ফসল কর্তন (বিঘা প্রতি ৪ জন) শ্রমিক	৬০০×৪=২৪০০/-
২। বিছালি তৈরি এবং পরিবহন (৫ জন)	৬০০×৫=৩০০০/-
৩। মাড়াই, ঝাড়াই (২জন)	৬০০×২=১২০০/-
৪। মেশিনের তেল/বিদ্যুৎ এবং মেশিন ভাড়া	১০০+১০০=২০০/-
৫। ফসল ধান বস্তাবন্দীকরণ মজুতকরণ ০.৫ জন।	(৬০০÷২)+(১০০÷২)=৩৫০/-
৬। বাজারজাতকরণ পরিবহন	৪০০/-
এ পর্বের ব্যয়	৭৫৫০/-

* ফসল কর্তনের সময় শ্রমব্যয় অধিক ফলে প্রতিজন ৬০০ ধরে।
* মাড়াই, ঝাড়াই, বস্তাবন্দী, মজুতকরণে, পরিবারের নারী, শিশুসহ, অন্যান্য ব্যয় ধরা হয়নি।
* দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, অস্বাভাবিক দূরত্বের পরিবহন ব্যয় ধরা হয়নি।

একবিঘা = ৫০ শতাংশ এর দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান ব্যয় (ক, খ এবং গ এর যোগফল)

কার্যক্রম	দৃশ্যমান খরচ (টাকা)	অদৃশ্যমান খরচ (টাকা)	মোট ব্যয় (দৃশ্যমান+অদৃশ্যমান)
ক	৩,৩৫০/-	২০০/-	৩৫৫০/-
খ	১৭,৪৮০/-	২,৮০০/-	২০২৮০/-
গ	৭,৫৫০/-	২,১০০/-	৯৬৫০/-
ক+খ+গ এর যোগফল	২৮,৩৮০/-	৫,১০০/-	৩৩,৪৮০/-

* অদৃশ্যমান ব্যয়: আবাসন, আহার, ওষুধ, পান-তামাক, গাঁজাসহ পারিবারিক শ্রম ব্যয় ভোগান্তি ব্যয় ইত্যাদি। (শ্রমপ্রতি ২০০ টাকা ধরে) যদিও পারিবারিক ভোগান্তি আর্থিকভাবে পরিমাপ করা কঠিন।

ইরি বোরো মৌসুমে ধানের উৎপাদন থেকে আয়ের হিসাব

উৎপাদিত পণ্য	উৎপাদনের পরিমাণ	দর	মোট আয়
মোটা ধান	৩০ মণ	৬০০	১৮,০০০
বিছালি (খড়)	৩ কাউন্ট	১,২০০	৩,৬০০
চিটা	৩ বস্তা	৫০	১৫০
			২১,৭৫০

ইরি বোরো মৌসুমে ধান উৎপাদনের নীট ক্ষতি (১ বিঘা = ৫০ শতাংশ জমিতে)
নিট ক্ষতি

ব্যয়: ৩৩,৪৮০
আয়: – ২১,৭৫০
১১,৭৩০ (এগারো হাজার সাতশত ত্রিশ টাকা)

ধান (মোটা) এর বয়স ১৪০ দিন ধরে-
(ক) প্রতি মৌসুমে ক্ষতি = ১১,৭৩০ টাকা ।
(খ) প্রতি দিন ক্ষতি = ৮৩.৭৮/৮৪ টাকা।
(গ) এক দশকে ক্ষতি = ১,১৭,৩০০ টাকা
(১০ মৌসুম ধরে)

- এই ক্ষতি কৃষক বাণিজ্যিকভাবে হিসাব করে না।
- ধীরে ধীরে ব্যয় করে শোষিত হয় বুঝে না।
- নিজের এবং পরিবারের শ্রম ও ভোগান্তি ব্যয় ধরে না।
- নিজের জমির ব্যবহার মূল্য হিসাব করে না।
- নিজেস্ব উৎপাদিত জৈব সার বিবেচনায় আনে না।

ক্ষতি চক্র/নিঃশ্বায়নের প্রক্রিয়া শুরু

২য় বছর পর: নিম্ন বিত্ত কৃষকের ক্ষেত্রে—

- গবাদিপশু বিক্রি শুরু অথবা
- গাছ বা অন্য সম্পদ অথবা
- পরিবারের অন্য কেউ থাকলে তার অর্থ নিতে হবে অথবা
- আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের নিকট সহায়তা নিতে হবে।

৪র্থ বছর পর

- NGO ঋণের জালে আটকা পড়বে
- প্রতিষ্ঠানিক ঋণের উৎস্য খুজবে।

৬ষ্ঠ বছর পর

- প্রতিষ্ঠানিক ঋণের জালে আটকা পড়বে।
- পেশা পরিবর্তনের চিন্তা করবে।

৮ম বছর পর

- একাধিক পেশায় যুক্ত হবে
- পরিবারের কেউ স্বচ্ছল থাকলে তার / তাদের সহায়তায় কৃষি টা চলবে অথবা
- ঐ জমি বন্ধক রেখে কৃষি কাজ চলবে।

১ দশক পর

- জমির আংশিক বিক্রি শুরু করবে
- নিজের জমির সাথে বর্গাচাষি রূপে আবির্ভূত হবে
- ভূমি বিচ্যুতির প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবে

ইরি (মোটা) ধানের মূল্য এবং অন্যান্য পণ্যের মূল্যের তুলনা
(জুলাই-১৯) (এক মণ ৪০ কেজি ধানের বিনিময় হার)

পণ্য	পরিমাণ	দাম	ধান ১ মণ অন্যান্য
চাল মাঝারি	১ কেজি	৪০ টাকা	১ : ১৫
কাঁচামরিচ	১ কেজি	৮০ টাকা	১ : ৭.৫
পেঁয়াজ	১ কেজি	৬০ টাকা	১ : ১০
চিংড়ি মাছ (গলদা ১০ গ্রেড)	১ কেজি	৮০০ টাকা	১ : ০.৭৫
ইলিশ মাছ	১ কেজি	১০০০ টাকা	১ : ০.৬
ডাক্তারের ফি	১ম বার	৮০০ টাকা	১ : ০.৭৫
মেডিকেল টেস্ট	সিটি স্ক্যান ১ বার সাধারণ	৪০০০ টাকা	১ : ০.১৫
শিক্ষকের কোচিং (ব্যাচ)	১ মাস = ১২ দিন	৮০০ টাকা	১ : ০.৭৫
শিক্ষকের বেতন (বাসায়)	১ মাস= ১২ দিন	৪০০০ টাকা	১ : ০.১৫
বাড়ি ভাড়া (গ্রামকেন্দ্রীক)	সেমি পাকা (মাসিক)	৩০০০ টাকা	১ : ০.২
বাড়ি ভাড়া (উপশহর)	পাকা	৬০০০ টাকা	১ : ০১
কাপড়	১ বার ০৫ জনের কৃষক, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, মা	৪০০০ টাকা	১ : ০.১৫
গামছা-লুঙ্গি+গেঞ্জি = ৬০০			
শাড়ি+ব্লাউজ+পেটিকোট=৯০০			
শাড়ি+ব্লাউজ+পেটিকোট=৭০০			
শার্ট+প্যান্ট=৮০০			
থ্রি পিস =১০০০			
বিদ্যুৎ	ইউনিট ২/৩	১৫০০ টাকা	১ : ০.৪
মোবাইলসহ ন্যূনতম ইলেকট্রনিকস সামগ্রীর ব্যবহারসহ			

- একজন কৃষক ১ বিঘা (৫০ শতাংশ) জমি চাষ করে ১ মৌসুমে দোফসলি জমিতে ৩০ মণ ধান উৎপাদন করলে তার মূল্য ১৮,০০০ টাকা হলে ধান বিক্রির আয় থেকে সে,
- ২টা বাচ্চার শিক্ষকের ব্যাচে কোচিং ফি ৬ মাসে ৯৬০০ এবং ঐ পরিবার প্রতিদিন ২ কেজি চাল ভোগ করলে ৩.০৫ মাসের খাদ্যের সংস্থান হবে অন্য কিছু করতে পারবে না।

  অথবা,

- পরিবারের সদস্যরা যদি ১ বার করে ডাক্তারের নিকট যায় এবং ২ জন একবার করে সিটি স্ক্যান করে, তাহলে ২ মাস ১৫ দিনের খাদ্যের সংস্থান করতে পারবে; আর কিছু করতে পারবে না।

  অথবা,

- ৬ মাসে যদি ২ বার কাপড় ক্রয় করে, তাহলে বাকি টাকায় খাদ্যের সংস্থান হবে মাত্র ৪ মাসের; অন্যকিছু হবে না।

  অথবা

- উৎপাদিত ফসল (ধান) দিয়ে যদি তার সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহ করতে হয়, তাহলে সর্বোচ্চ ২ মাসের বেশি সংসারিক ব্যয় নির্বাহ হবে না।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক দিক ভাবনা-পুনর্ভাবনা

- ধান বিক্রি না করে কমিউনিটি বেজ চাল উৎপাদন করলে লাভ হতো কিনা এবং চাল তৈরি ও দাম নিয়ন্ত্রণকারী সিন্ডিকেট ভাঙ্গতো কি না?
- ধান ক্রয় বিক্রয় থেকে বর্তমান প্রকৃয়ার মধ্যস্বত্ব ভোগী, ফড়িয়া এবং চালকল মালিকদের অস্বাভাবিক লভ্যাংশ বিশেষ প্রকৃয়ায় কৃষকদের অনুকূলে প্রবাহিত হলে কী হতো?
- বাংলাদেশের কৃষির অন্যতম পণ্য ধানের উৎপাদন যদি অলাভজনক হয় তাহলে তাত্ত্বিকভাবে S.D.G/ M.D.G অর্জিত হবে না কি? স্থিতিশীল বঞ্চায়ন/ নিঃশ্বায়ন হবে।
- ধান চাষ অলাভজনক হলে ভবিষ্যতে কৃষকরা এ চাষ বন্ধ করে অন্য পেশার যাবেন কি না? আর গেলে খাদ্যনিরাপত্তার কি হবে?
- এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? বাজারব্যবস্থা, সিন্ডিকেট না সরকার?
- দায়ী যে-ই হোক কৃষিকে লাভজনক করতে উদ্যোগী হবেন কে? জনগন, রাজনৈতিক দল, বা সরকার?
- ভুক্তভোগী কৃষক যদি উদ্যোগী হয় তাহলে তাদের নেতৃত্বই বা কে দেবেন?
- মুক্তিযুদ্ধো আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পর কৃষি, কৃষকের বাস্তব অবস্থা চাষ মৌসুমে সরকারি/বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অথবা বঞ্চনায়নের মাত্রা, খাত/ক্ষেত্র।
- রাষ্ট্রের কৃষিসংশ্লিষ্ট ৭০/৮০ ভাগ ভুক্তভোগী মানুষ যদি তার শোষণের সঠিক খাত-ক্ষেত্র বুঝে সঠিক নেতৃত্বে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে জন্য উদ্যোগী হয়, তার রূপ কেমন হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি ...।

কৃষি যদি লাভজনক হতো, তাহলে অর্থনীতির ওপর কী প্রভাব হতো?

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। এ দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি। দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষি চাষের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ কৃষি লাভজনক হলে ৭০% মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত। এখন ক্রয়ক্ষমতাহীন বা কম ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হতো। গ্রামীণ অর্থনীতির খাতসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি পেত। শহুরে কৃষিনির্ভর শিল্প উন্নয়ন সম্ভব হতো। বাংলাদেশে বর্তমানে ধনবৈষম্যের গতিপ্রকৃতি বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে। উপর তলায় ১০% মানুষের কাছে ৯০% সম্পদ পুঞ্জীভূত। আর বাকি ৯০% মানুষ ১০% সম্পদ ভোগ করে। এখানেও নিম্নশ্রেণির উচ্চবর্গের মানুষের হাতে উক্ত ১০% সম্পদের বেশির ভাগ দখলে। ফলে প্রকৃতভাবে কৃষক বা শ্রমিক অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষের অর্থসামাজিক অবস্থা খুবই নাজুক। অর্থনৈতিক বঞ্চনাহেতু সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বঞ্চনারও শিকার। এ মানুষগুলোর নিজের শক্তি সামর্থ্য কম হওয়ায় রাজনৈতিক এবং সামাজিক অপব্যবহারের শিকার হয়। কিন্তু এরা শুধু উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পেলে স্থিতিশীল আর্থসামাজিক ভিত্তি সৃষ্টি করতে পারত, স্থিতিশীল বঞ্চনায়নপ্রক্রিয়ার বিপরীতে MDG আর SDG জাতীয় যত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করি না কেন, তা অর্জন সম্ভব হতো।

কৃষি উৎপাদনের সাথে কৃষক পরিবারের কোনো কোনো সদস্য যুক্ত কিন্তু শ্রমের মূল্যায়ন হয় না

কৃষি উৎপাদনের সাথে কৃষক পরিবারের মূল কর্তাব্যক্তি যিনি ঐ পরিবারের কৃষিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তার শ্রমমূল্য কখনো কখনো আংশিক মূল্যায়নে আনলেও অন্য অনেকে আছে, যাদের শ্রমমূল্য কৃষি

উৎপাদনের সাথে হিসাব করা হয় না। যদি তাদের শ্রমমূল্য হিসাব করা হতো, তাহলে কৃষি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেত। অন্যভাবে ভাবলে ঐ অমূল্যায়িত শ্রমশক্তি যদি মূল্যায়ন করা এবং তাদের পরিশ্রমিক দেওয়া হতো, তাহলে তাদের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পেত। ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত, আর্থসামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেত, দেশের টেকসই উন্নয়ন তরান্বিত হতো, সর্বপরি কৃষিপণ্য উৎপাদনে দৃশ্যমান ব্যয় বৃদ্ধি পেত।

ব্যক্তি	কৃষি উৎপাদনে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্র
প্রবীণ নারী / পুরুষ	কৃষিশ্রমিকদের দিকনির্দেশনা দেওয়া, বীজের অঙ্কুরোদ্গমে সহায়তা, কৃষিশ্রমিকদের খাদ্যপ্রস্তুতে সহয়তা, ফসল মাড়াইঝাড়াই বিপণনের সহায়তা কার্যক্রম।
কিশোর / কিশোরী যুবক / যুবতী	থাকার ব্যবস্থা করা, শ্রমিক আনা নেওয়া, বীজ সার পরিবহন, কীটনাশক সার প্রয়োগ বীজ বপন, বীজ এবং পণ্যের শ্রেণীকরণ করা ইত্যাদি।

অলাভজনক কৃষিব্যবস্থাই দীর্ঘমেয়াদি বৈষম্য বঞ্চনা এবং দারিদ্র্য সৃষ্টির কারণ-খাত/ক্ষেত্র

কারণ	অভিঘাত
* অনুপস্থিত ভূস্বামীদের নিকট ক্রমশ ভূমির পুঞ্জীভবন।	মাঝারি এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের ভূমিচ্যুতি প্রান্তিক ও ভূমিহীনে পরিণত।
* বর্গাদার এবং ইজারাদার কৃষকের আধিক্যতা।	জীবনধারণ কষ্টসাধ্য অন্যান্য পণ্যের কার্যকর চাহিদা হ্রাস।
* কৃষিপণ্যের বিপণনে কয়েক ধাপে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য।	অলাভজনক কৃষির কারণে কৃষক পরিবার নিঃশ্বায়ন প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত।
* উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় কার্যকর সরকারি আর্থিক প্রণোদনাহীনতা এবং ঋণপ্রক্রিয়ার জটিলতা।	এনজিও, মহানজন, দালাল, ফড়িয়া, ব্যবসায়ীদের চড়া সুদে ঋণের জালে পুনঃপুনঃ আটকে পড়ে শেষবিচারে ভূমিচ্যুতি।
* প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশেষ করে বন্যা, জলাবদ্ধতা, নদীভাঙন, সাইক্লোন হেতু ফসল/জমিহানি।	বাস্তুচ্যুতি গ্রামীণ জীবনে কর্মহীনতা, শহরমুখী অভিগমন অনৈতিক কার্যক্রম এবং সামাজিক সংকটের জন্ম।
* কৃষি পরিবারের সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে বঞ্চনা এবং অনৈতিক ও বাণিজ্যিক পন্থার কারণে চাকরির বাজারে প্রবেশ করতে না পারা।	বংশপরম্পরায় আর্থসামাজিক নিঃশ্বায়ন ও বঞ্চনায়নের সাথে যুক্ত।

ক্ষতি হলেও কেন চাষ করেন?

- বিকল্প কাজ বা চাষের সুযোগ নেই/কম।
- বাণিজ্যিক হিসাব করেন না, ধীরে ধীরে বিনিয়োগ করেন।
- নিজ এবং পরিবারের শ্রমের হিসাব করেন না।
- নিজেস্ব জমি/পৈত্রিক জমির মূল্য হিসাব করেন না।
- পারিবারিক খাদ্য জোগানের নিশ্চয়তা।
- গবাদিপশুর খাদ্য জোগানের নিশ্চয়তা।

- ক্ষতি হলেও ফসল বিক্রি করে আপৎকালীন ব্যয় নির্বাহ।
- আশা করে পরবর্তী বছর/মৌসুমে লাভ হবে।
- নিজেস্ব জমি পতিত/আগাছা না রেখে কিছু একটা করা।
- অনেক নিম্নবিত্ত কৃষি পরিবার অন্য কোথাও অন্য কাজ করতে পারে না। ফলে নিজের জমিতে কাজ করতে উদ্যোগী হয়।
- ফসলের গন্ধে ভালোবাসার টানে।
- এ ফসল ছাড়া অন্য লাভজনক বিকল্প চাষের বিষয়টি তার সামনে কৃষি/সরকারি দপ্তর কেউ আনেনি।

সুপারিশসমূহ

- কৃষক এবং কৃষিকে জাতীয়করণ করতে হবে। সরকারের কৃষি দপ্তরের অধীন নির্ধারিত উৎপাদন খামারে উৎপাদন পরিচালিত হবে।
- যৌথ খামার পদ্ধতিতে চাষ: বীজতলা তৈরি, চারা উৎপাদন, রোপণ, কর্তন, মাড়াই, বাজারজাতকরণ, সার এবং ওষুধ প্রয়োগ এবং সেচব্যবস্থাপনার যান্ত্রিকীকারণ সহজ হবে।
- কৃষি দপ্তরকে দায়বদ্ধতার জায়গায় নিয়ে আসতে হবে।
- মাটি পরীক্ষা করে, সাঠিক ফসল, পরিমিত সার-সেচ-কীটনাশক, ফসলের জাত নির্ধারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন এবং প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া ফসলের ক্ষতি হলে কৃষকের সাথে কৃষি দপ্তর/কর্মকর্তাকেও দায় নিতে হবে।
- প্রকৃত তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে সঠিক চাহিদা এবং জোগান কত তা নির্ধারণ করা। বাজার অর্থনীতির কারণে কখনও কোনো পণ্যের অধিক উৎপাদন কম দাম, কম উৎপাদন অধিক দাম, উৎপাদন ব্যয় না ওঠা, আবার কোনো সময় ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতাহীনতা—এ অবস্থার পরিসমাপ্তি দরকার।
- কৃষি উৎপাদন জোন করা। প্রকৃতপক্ষে মাটি, পানি, পরিবেশ ভৌগোলিক কাঠামোভেদে যে এলাকায় যে ফসল উৎপাদন লাভজনক, সে এলাকায় সেই ফসল উৎপাদন করার ব্যবস্থা করা দরকার এবং পরিকল্পিতভাবে চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদনের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দরকার।
- কৃষকদেরকে ধানের পরিবর্তে চাল তৈরি এবং বিক্রির কৌশলের দিকে নিতে হবে। এতে কৃষকের লাভ এবং চাল উৎপাদন সিন্ডিকেট ভেঙে যেতে পারে। কৃষক ও তার পরিবারের সারাবছরে কাজের ব্যবস্থা হবে। মৌসুমী বেকারত্ব হ্রাস পাবে।
- কৃষিপণ্যে নয়, কৃষি উৎপাদনে সরাসরি কৃষকদের অনুকূলে সরকারি ভর্তুকি প্রদান করতে হবে। কৃষিপণ্যের ভর্তুকি বর্তমানে বেশির ভাগই মধ্যস্বত্বভোগীর অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছে।
- আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যয়হ্রাস কৌশলসম্পর্কিত কৃষি উৎপাদনকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
- কৃষি উৎপাদন মৌসুমে কৃষকদের কম সুদে সিসি ঋণ প্রদান এবং মৌসুম শেষে সরকারি ক্রয়নীতির আলোকে শস্যের বিনিময়ে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা দরকার।
- সেচের ব্যয়হ্রাসের জন্য কৃষিতে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার না করে, ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করতে হবে। এ লক্ষ্যে নদীনালা, জলাধার খনন, পুনঃখনন করতে হবে, জলাবদ্ধতা হ্রাস করতে হবে।

- ভেজাল, নকল, সার/বীজ/তেল, কীটনাশকের কারণে ফসলের ক্ষতির দায় কোম্পানি/সরকারকে বহন করতে হবে। এ লক্ষে শস্যবীমা চালু করা জরুরি।
- বর্গাদারি/লিজ উৎপাদনপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ভূস্বামীদের তার জমি চাষের জন্য বর্গাদার/লিজকারীকে উৎপাদনকালীন নগদ ব্যয়ের একটা অংশ প্রদানের নীতির আয়তায় আনা সমীচীন।
- সামগ্রিক উৎপাদনব্যবস্থার আলোকে কৃষকদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষির সাথে কৃষকের কার্যকর সম্পর্ক জরুরি।

উপসংহার

গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের ভাষায়, "আর্থসামাজিক বিকাশপ্রক্রিয়ায় বঞ্চিতদের বঞ্চনা বৃদ্ধি উন্নয়ন নয়, বরং এ প্রক্রিয়ায় বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তিই সত্যিকার উন্নয়ন"—আমি এ বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস এবং সমর্থন করি। হ্যাঁ, বাংলাদেশ এখন ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। তাত্ত্বিকভাবে জাতীয় নীতির ভিত্তিতে MDG/SDG অর্জিত হচ্ছে, হবে। অপরদিকে দেশের আয় এবং ধনবৈষম্য সমান তালে নয়, অধিক হারে বেড়ে চলেছে। যেখানে উপরের ১০ শতাংশ মানুষ মোট সম্পদের ৯০ শতাংশ দখল-পুনর্দখল করছে, অপরদিকে নিচের ৯০ শতাংশ মানুষ মোট সম্পদের ১০ শতাংশেরও মালিকানা পাচ্ছে না। এখানে ভূমি-জলা-জঙ্গলে সাধারণ জনমানবের শ্রমঘাম বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত হয়, সৃষ্টি হয় সম্পদ; আর এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত-বহিঃস্থ থাকেন ঐ প্রান্তিক জনমানব। শোষণপ্রক্রিয়ায় অধিকাংশ সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক বনে যায় অনুপস্থিত ভূস্বামী-রেন্টসিকারসহ শোষকেরা। দেশে যত উন্নয়ন, কৃষকের তত বঞ্চনা—এটাকে আমি বলি উন্নয়নের বঞ্চনা। কৃষির সাথে যুক্ত থেকে বহুমাত্রিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছে কৃষক, কৃষি পরিবার, কৃষি পরিকাঠামো শত শত বছর ধরে। কৃষক খাদ্যের জোগানদার, সম্পদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু মাটির টানে-ফসলের ঘ্রাণে নিঃশ্বায়ন ও বঞ্চনায়নের দিকে যাচ্ছে কৃষি ও কৃষক। সম্পদের মালিক হচ্ছে শোষক শ্রেণি। এটা কৃষকের অনিচ্ছাকৃত ভালোবাসা। আমি বলি কৃষকের ব্যতিক্রমধর্মী ভালোবাসার অর্থনীতি। কৃষকের এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য চাই চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। আর এ জন্য প্রয়োজন সমস্ত শ্রেণিরপেশার মানুষের ভাবনা-পুনর্ভাবনা।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশে কৃষি ভূমি জলা-সংস্কার: দুর্বৃত্তবেষ্টিত কাঠামোতে সবচেয়ে অমীমাংসিত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিষয়—আবুল বারকাত।

২. বাংলাদেশের কৃষি ভূমি জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি—অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত (মুক্তিবুদ্ধি প্রকাশনা)

৩. বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য: সমাধান কোন্ পথে—অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম।

৪. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও পানি ব্যবস্থাপনার অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা (ভবদহ অঞ্চলের পর্যালোচনা)—মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

৫. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

৬. প্রথম আলো, ২৬ মে ২০১৯

৭. নতুন কথা, ১৮ আগষ্ট ২০১৯ (ড. আবুল হোসেন)

৮. কৃষিকথা, জুলাই-আগষ্ট-২০১৯

৯. দৈনিক জন্মভূমি, ২৯ মে ২০১৮

১০ কৃষকদের সরাসরি সাক্ষাৎকার।